

আজ

কি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য

জিহাদ ফরজ নয়???

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসান্না শামসান শাফি জাহলাহ

اداره التحاب، برصغیر

হি. ১৪৩৭ - জুল হিজ্জাহ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

হিজরী-পনেরতম শতাব্দীর চাঁদ আমাদের উপর এমন সময় উদিত হয়েছে যখন ভূপৃষ্ঠের কোথাও ইসলাম বিজয়ী নয়। এটা সেই ইসলাম যাকে আল্লাহ তায়ালা যমীনে প্রেরণ করেছেনই বিজয়ী রাখার জন্য। তিনি তাঁর নবী-রাসূলদের দ্বারা ইসলামকে বিজয়ী রেখেছেন এবং এর অনুসারীদেরকেও সে ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

“তিনি (আল্লাহ) সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যেন তিনি সেটাকে অন্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করতে পারেন। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।”

(সূরা আত তাওবাহ ৯:৩৩)

এটা সেই ইসলাম ছিল যার অনুসারীরা তের শতাব্দী যাবত তার মাথা সামান্যতম নত হতে দেয়নি। মুসলমানদের এক হাত যদি ইসলামের ঝান্ডা রক্ষা করতে অপারগ হয়ে যেত তাহলে অপর হাত আগ বাড়িয়ে তা তুলে নিত। যে মূল্যবান সম্পদ রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর সাহাবীগণ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন, পরবর্তী প্রজন্ম সেটাকে আরো আগে বাড়িয়ে নিয়েছেন। উমাইয়া এবং আব্বাসী খলীফারা তা বিজয়ী রেখেছেন। কখনো ‘সেলজুক’^১ ও ‘মুরাবিত’^২ সম্রাটরা তার পতাকা সমুন্নত রেখেছেন। কখনো জঙ্গিরা^৩, কখনো আইয়ুবীরা^৪ ইসলামের বিরুদ্ধে কামানের গোলা প্রতিরোধ করেছেন। কখনো বা

^১ সেলজুক আরবীতে যাকে السلاجقة বলে। সুন্নী মুসলিম সাম্রাজ্য, যারা এগারো শতাব্দী থেকে চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্য এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্য শাসন করে। শায়েখ আবু আলী আল-হাসান আল তুসি নিয়াম উল-মুলক (১০১৮-১০৯২), যিনি খাজা নিয়ামুল মুলক নামে অধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন পারস্যের আলিম এবং সেলজুক সাম্রাজ্যের উজির। অল্পকালের জন্য তিনি সেলজুক সাম্রাজ্যের শাসক হিসেবেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। (অনুবাদক)

^২ মুরাবিতিন হল দক্ষিণ মরোক্কো, আলজেরিয়া ও মৌরিতানিয়ার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত একটি রাজ্য। মুরাবিতিন রাজ্য একদল মুসলিম যোদ্ধা ও আলেম দ্বারা পরিচালিত হত। (অনুবাদক)

^৩ জঙ্গি সাম্রাজ্য ছিল অঘুজ তুর্কি বংশোদ্ভূত একটি মুসলিম সাম্রাজ্য। সেলজুক সাম্রাজ্যের পক্ষ হয়ে তারা সিরিয়ার অংশবিশেষ ও উত্তর ইরাকের শাসন পরিচালনা করে। ইমাদউদ্দিন জঙ্গি রহিমাছল্লাহ এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাম্রাজ্য (১১২৭ থেকে ১২৫০) তের শতক পর্যন্ত উত্তর ইরাকে শাসন করতে সক্ষম হয়। ইতিহাসের অন্যতম নায়ক নুরুদ্দিন জঙ্গি রহিমাছল্লাহ এই সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন।

^৪ কুর্দি বংশোদ্ভূত মুসলিম সাম্রাজ্য। ক্রুসেডারদের যম সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি রহিমাছল্লাহ এটির প্রতিষ্ঠাতা এবং মিশর এর কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বার ও তের শতকে (১১৫৪-১২৫৮) এই সাম্রাজ্য মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত। ১১৮৩ সাল নাগাদ মিশর, সিরিয়া, উত্তর মেসোপটেমিয়া, হেজাজ, ইয়েমেন ও আধুনিক তিউনিসিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার উপকূল এই সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। ১১৮৭ সালে হিভিনের যুদ্ধের পর জেরুজালেম রাজ্যের অধিকাংশ ও জর্ডান নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা সালাউদ্দিন আইয়ুবি রহিমাছল্লাহর করায়ত্ত হয়।

মামলুক^৫ শাসকেরা আল্লাহর কালেমা সমুন্নত রেখেছেন। অবশেষে ইসলাম এবং আল্লাহর কালিমার মাথা উঁচু করার দায়িত্বভার তুর্কীরা^৬ নিজেদের কাঁধে নেয়। ছয় শতাব্দী অবধি তারা অবিরাম আল্লাহর কালিমা সমুন্নত রাখার ফরয বিধানের দায়িত্ব পালন করেছে।

সাইবেরিয়ার বরফাঞ্চল থেকে আফ্রিকার মরুঞ্চল পর্যন্ত, মধ্য এশিয়ার পাহাড়ি অঞ্চল থেকে ইন্দোনেশিয়ার দীপাঞ্চল পর্যন্ত এমনকি ইউরোপেরও বেশ বড় অঞ্চলে ইসলামের বিজয়ী ঝান্ডা তাঁরা উড্ডয়ন করেছেন। আজো পর্যন্ত ইউরোপের অধিবাসীদের ইয়ালদরমের^৭ আক্রমণসমূহ এবং বারবারুসার^৮ সামুদ্রিক অভিযানসমূহের কথা স্মরণ আছে।

^৫ মামলুক সালতানাত ছিল মধ্যযুগের মিশর, লেভান্ট, তিহামাহ ও হেজাজ জুড়ে বিস্তৃত একটি মুসলিম রাজ্য। আইয়ুবীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ১৫১৭ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্যের মিশর বিজয়ের আগ পর্যন্ত মামলুকরা ক্ষমতায় ছিল। সালতানাতের শাসকশ্রেণী মামলুক ছিল।

^৬ উসমানীয় সাম্রাজ্য ঐতিহাসিকভাবে তুর্কি সাম্রাজ্য বা তুরস্ক বলে পরিচিত, ছিল একটি ইসলামি সাম্রাজ্য। ১২৯৯ সালে অঘুজ তুর্কি বংশোদ্ভূত প্রথম উসমান উত্তরপশ্চিম আনাতোলিয়ায় এই সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান প্রথম মুরাদ কর্তৃক বলকান জয়ের মাধ্যমে উসমানীয় সাম্রাজ্য বহুমহাদেশীয় সাম্রাজ্য হয়ে উঠে। ১৪৫৩ সালে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের (হাদিসে ভবিষ্যতবাণীকৃত) কনস্টান্টিনোপল জয় করার মাধ্যমে উসমানীয়রা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করে এবং ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে বিশেষত সুলতান প্রথম সুলায়মানের সময় উসমানীয় সাম্রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া, ককেশাস, উত্তর আফ্রিকা ও হর্ন অব আফ্রিকা জুড়ে বিস্তৃত একটি শক্তিশালী বহুজাতিক, বহুভাষিক সাম্রাজ্য ছিল। ১৭শ শতাব্দীর শুরুতে সাম্রাজ্যে ৩২টি প্রদেশ ও বেশ কয়েকটি অনুগত রাজ্য ছিল। এসবের কিছু পরে সাম্রাজ্যের সাথে একীভূত করে নেয়া হয় এবং বাকিগুলোকে কিছুমাত্রায় স্বায়ত্ত্বশাসন দেয়া হয়। উসমানীয় সাম্রাজ্য ছয় শতাব্দী ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে।

^৭ প্রথম বায়েজিদ (ডাকনাম *ইলদিরিম* অর্থ "বজ্রপাত") (১৩৬০ – ৮ মার্চ ১৪০৩) ছিলেন বুজুর্গ উসমানীয় সুলতান। তিনি ১৩৮৯ থেকে ১৪০২ সাল পর্যন্ত শাসন করেছেন। তিনি সুলতান প্রথম মুরাদ ও গুলচিচেক খাতুনের পুত্র। বায়েজিদ ইয়ালদরম ছিলেন অত্যন্ত সাহসী সুলতান যিনি কুছতুনতুনিয়া তথা কন্সট্যান্টিনোপল ও সমগ্র ইউরোপ জয়ের জন্য মনস্তির করেন। তুর্কি 'ইয়ালদরম' শব্দের অর্থ 'বজ্র'। তিনি এমনই তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন যে, জনগণই তাঁকে 'ইয়ালদরম' নামে অভিহিত করতো। ১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এতটাই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন যে কুছতুনতুনিয়া তথা কন্সট্যান্টিনোপল অবরোধ করেন এবং বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যান। কিন্তু কন্সট্যান্টিনোপলের খ্রিস্টান শাসক জিজিয়া কর দিতে সম্মত হয় ও বায়েজিদ ইয়ালদরমের নিকট আরও শপথ করে যে, তাঁকে না জানিয়ে কন্সট্যান্টিনোপলে নতুন কোন শাসনকর্তা কখনও নিয়োগ করবে না এবং এ বিষয়ে বায়েজিদ ইয়ালদরমের নিকট থেকে অনুমতি লাভ করে। এই শর্তাবলী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ছিলো যারা কিনা একসময় সমগ্র খ্রিস্টান জগতকে নেতৃত্ব দিয়েছিলো, এখন তারা এমন নাজুক পরিস্থিতিতে পতিত হল যে তাদের শাসকগণ মুসলমানদের অনুমতির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লো।

সুলতান বায়েজিদ ওরফে ইয়ালদরম (১৩৮৯ – ১৪০২ খ্রি) তার সর্বশক্তি দিয়ে শহর অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম জাতির দুর্ভাগ্য তৈমুর লং নামক এক ল্যাংড়া যুদ্ধবাজ সুলতানকে কাপুরোষোচিত হামলার মাধ্যমে পরাজিত ও বন্দী করেন। তৈমুর লং এর এহেন আহম্মকীর কারণে মুসলমানগণ ইউরোপে খ্রিস্টানদের যে চাপের মুখে রেখেছিলো তা থেকে খ্রিস্টানরা রেহাই পেয়ে যায়। সুলতান বায়েজিদ ইয়ালদরম বন্দী অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইম্নালিল্লাহি ওয়া ইম্না ইলাইহি রাজিউন।

^৮ তিনি হচ্ছেন ইসলামের ইতিহাসে নৌ-জিহাদের এক অকুতোভয় নায়ক। প্রথম উসমানি খলীফা সুলতান সেলিম ও তদ্বীয় পুত্র মহামতি সোলায়মানের আমলে তিনি ছিলেন খেলাফতের নৌ-বাহিনীর প্রধান। ১৪৭২ সালে জন্ম নেওয়া এই বীরের মৃত্যু হয় ১৫৪৬ সালে। তাঁর সুদক্ষ নৌ-পরিচালনায় তৎকালীন ইউরোপের সব রাষ্ট্র তটস্থ থাকতো। ভূ-মধ্য সাগরে তখন ছিলো উসমানি খিলাফতের একচ্ছত্র আধিপত্য। তিনি একে একে হামলা পরিচালনা করেন ফ্রান্স-স্পেন, পর্তুগাল সহ সমস্ত ইউরোপের নৌ-বহরে। তাই ইউরোপের প্রত্যেক দেশকেই সমুদ্রপথে খিলাফাহকে ট্যাক্স দিয়ে চলতে হতো। স্পেন থেকে যখন মুসলিম উচ্ছেদাভিযান চলছিলো, তখন এই বারবারুস ১৫০৪ ও ১৫১০ সালে তাঁর নৌবহর নিয়ে স্পেন উপকূলে উপস্থিত হন। উদ্ধার করেন ৭০ হাজারের মতো

এ পুরো ইতিহাস এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, মুসলমান এ কথা খুব ভাল করে জানত যে, স্বীয় ধর্মের সাথে সম্পর্কের দাবি নিজের সত্তার উপর এমনকি পুরো জগতের উপর বিজয়ী করতে হবে। তারা খুব ভাল করেই জানত যে, তাদের ধর্ম শুধু ঘর এবং মসজিদ-মাদ্রাসার চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। বরং অর্থ, সমাজ, সংবিধান এবং ক্ষমতা সর্বক্ষেত্রে অগ্রে থাকে। তারা আরো জানত যে, এ ধর্ম অন্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য এসেছে এবং মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে বের করে এক ‘লা-শারীকালাহ’ আল্লাহর গোলামী ও ইবাদতের দিকে নিয়ে যেতে এসেছে। তারা এ কথাও জানত যে, (ইসলামের) এই বিজয় অর্জিত হবে একমাত্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করা, জিহাদ ও কিতাল করা এবং কাফেরদের ক্ষতিসাধন করার মাধ্যমে। তাদের আইন-কানুনের অধীনে জীবন যাপন করার মাধ্যমে হবে না। আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

আল্লাহ তায়ালা বদরের ময়দানে এক ব্যবসায়ী কাফেলার বিপরীতে সহায়-সম্বলহীন ফসল আবাদকারী সৈন্যদের দ্বারা মোকাবেলা করার মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, এ দ্বীনের বিজয় এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠাকরণ এ পথ ভিন্ন অন্য কোন পথে সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা সূরা আনফালের শুরুর দিকে বলেন,

وَ إِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

“আর স্মরণ কর যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দুদলের একটিকে ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় তা তোমাদের জন্য হবে। এবং তোমরা চাচ্ছিলে যে, অস্বহীন দলটি তোমাদের অধীনে চলে আসুক। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চাচ্ছিলেন যে, তিনি তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য প্রমাণ করবেন। যদিও অপরাধীরা বিষয়টি অপছন্দ করছিল।” (সূরা আনফাল, ৮:৭-৮)

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ - আয়াতে দ্বীনের যে বিজয়ের কথা বলা হয়েছে তা জিহাদ ও কিতালের শক্তির মাধ্যমে কাফেরদের শক্তির মোকাবেলা করার দ্বারা অর্জন হবে। তখনই কাফেরদের দাপট হ্রাস পাবে এবং মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আর ইসলামের শক্তির দর্শনের এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে বলে গেছেন- যে হাদিসটিকে বিভিন্ন শব্দে প্রায় তের জন সাহাবী - রাযিআল্লাহু আনহুম - বর্ণনা করেছেন।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. (رواه جماعة واللفظ لمسلم)

স্পেনের মুসলিম মুহাজিরকে। তাঁর এই অবদানের কারণে ইসলামের ইতিহাসে তিনি আজও নৌজিহাদের প্রতীক হয়ে আছেন। তাঁর প্রকৃত নাম হচ্ছে খাজির বিন ইয়াকুব, সুলতান সেলিম ১ম তাঁকে খায়রুদ্দীন পাশা উপাধি দেন। যেহেতু তাঁর দাড়ি লাল ছিলো এজন্যে ইউরোপীয়রা তাকে বারবারোসা অর্থাৎ, লাল দাড়িবিশিষ্ট উপনামে ডাকতো।

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যতক্ষণ না লোকসকল এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং আমার উপর এবং আমি যে দ্বীন নিয়ে এসেছি তার উপর ঈমান না আনে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং যখন তারা ঈমান আনবে তখন তাদের জান, মাল আমার থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।”

পুরো ইতিহাসের বিপরীতে আমরা আজ নিজেদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করি। যেন পুরো দুনিয়াটাই উলট-পালট হয়ে গেছে। আজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো মুসলমান নিজেকে স্বাধীন মনে করে। না হয় পাশ্চাত্যরা নামে মাত্র ‘স্বাধীনতা’ এর সুর এ পরিমাণ গেয়েছে যার ফলে একজন (সাধারণ) মুসলমানের এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তারা আজ স্বাধীন। অথচ বাস্তবতা হল, ইসলাম আজ পরাজিত। মুসলমান স্বাধীন আর ইসলাম পরাধীন- এ অদ্ভুত বিষয়টি আমরা পনেরতম শতাব্দিতে পেয়েছি। পঞ্চাশের অধিক (মুসলমানদের) রাষ্ট্র-যেখানে মুসলমান নিজেকে স্বাধীন মনে করছে। অথচ কোন একটি রাষ্ট্রও এমন নেই যেখানে ইসলাম স্বাধীন এবং বিজয়ী!! বরং সব জায়গায় ইসলাম পরাজিত এবং গোলাম হয়ে আছে!!!

ইসলামী রাষ্ট্রগুলো দেখুন! মিশরকে দেখুন, সুদানকে দেখুন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে দেখুন! না ইসলামী শিক্ষা আছে, না ইসলামী আইন-কানুন আছে। না অর্থব্যবস্থা ইসলামী, না সামাজিক জীবন ইসলামের আলোকে গঠিত। এমনকি ব্যক্তি-জীবনেও লোকেরা কুফরী আইনের পাবন্দী হয়ে আছে। অথচ পাশ্চাত্যের দাবী তো ছিল, মানুষ ব্যক্তি-জীবনে নিজ নিজ ধর্মের অনুসরণ করার অধিকার থাকে।

এছাড়াও ঐ সকল রাষ্ট্রের সরকার এবং সৈনিকরা কাফেরদের টেক্স দিচ্ছে। বাদশাহ থেকে নেমে বাদশাহর গোলাম হয়ে আছে। এ সকল রাষ্ট্রে মুসলমানদের ব্যক্তি-জীবনে সামান্য কিছু ইসলামী বিধানের অনুমতি ছাড়া ইসলামের বিজয় কোথায়! লা হাউলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!!

অন্য দিকে এমন অনেক মুসলিম রাষ্ট্র আছে যেখানে কাফেররা মুসলমানদের পায়ে পিষ্ট করছে এবং তাদের সেনাবাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আছে।

ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, সোমালিয়া এবং ইয়েমেন। তেমনিভাবে অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে আমেরিকার ড্রোন ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। এগুলো কি সরাসরি যুদ্ধ না?

এগুলো সব মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের অবিরাম যুদ্ধের ফলাফল। যার প্রথম ধাপে তারা উসমানী খেলাফত ধ্বংস করে এবং মুসলিম দেশগুলোকে নিজ অধীনে নিয়ে আসে। এরপর তাকে বিশ্বনীতির অষ্টোপাসে আটকিয়ে স্থানীয় দালালদের হাতে তুলে দিয়ে নামে মাত্র স্বাধীনতা দিয়েছে।

এ সকল যুদ্ধে কাফেরদের মূলত একটি সুক্ষ্ম দূরভিসন্ধি ছিল। সেটি হল, মুসলমান নিজেদের ধর্মকে ব্যক্তি-জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখবে এবং সামাজিক জীবনে ইসলামের বিজয়ের কল্পনা তাদের কাছে দ্বীনের অংশ হবে না। আর এটাই সমাজ থেকে দ্বীনের দূরত্ব এবং রাজনীতি থেকে দ্বীনের দূরত্ব!

বাস্তবতা হল, পাশ্চাত্যের কুফুরী শক্তি তাদের এ উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়েছে। এর প্রথম ধাপটি ছিল, যখন উসমানী খেলাফতের শেষদিকে মোস্তফা কামালের দল ‘جمعية اتحاد وترقى’ (তুর্কী ঐক্য পরিষদ) খলিফার কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে রাষ্ট্রীয় সংসদের কাছে দিয়েছিল এবং শরীয় আদালতের সাথে শহর কেন্দ্রিক আদালত প্রতিষ্ঠা করেছিল তখন। এ বিষয়ে খেলাফতে উসমানিয়ার শেষ দিকের শায়খুল ইসলাম মোস্তফা সাবাবী^৯ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, এটা রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে আলাদা করার পাশ্চাত্যের দুরভিসন্ধি। এবং তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন,

"معلوم أن الإمامة الكبرى التي يعبر عنها بالخلافة تتضمن حكومة تنفيذ الشريعة الإسلامية، بل ذلك موضوعها بعينه، فتجريد الحكومة عن الخلافة والتفريق بينهما يخرج الحكومة عن أن تكون حكومة إسلامية كتجريد أحد من المسلمين عن صفته الإسلامية والعياذ بالله. فمآل هذا إلى ارتداد الحكومة التركية عن دينها من حيث إنها حكومة"^{১০}

“ইমামতে কুবরা (বড় ইমামতী) যাকে খেলাফত বলা হয়, তা এমন রাজনীতিকে বুঝায় যা ইসলামী শরীয়তকে বাস্তবায়ন করে। বরং খেলাফত তো বলাই হয় ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়ন করাকে। সুতরাং রাজনীতিকে খেলাফত থেকে আলাদা করা এবং দুইয়ের মাঝে পার্থক্য করা মূলত রাজনীতি ইসলামী হওয়ার বিরোধিতা করার নামান্তর। যেমন মুসলমানদের কোন ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে (মুরতাদ হয়ে) যাওয়া। মায়াযাল্লাহ।”

আর এর ফলাফল দেখা গেছে তুর্কি খেলাফত ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। যার ফলে এখন তা শুধুই ইসলামী খেলাফতের মূল চিন্তা-চেতনার বিরোধী এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

তারপর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে রাজনীতি ও সমাজ থেকে ইসলামকে কর্মক্ষম করে দেয়ার ব্যাপারে শায়েখ মোস্তফা সাবাবী রহ. স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে গেছেন। তাঁর ভাষায়-

”لَكِنَّ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ أَنَّ هَذَا الْفَصْلَ مُؤَامَرَةٌ بِالْدِّينِ لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ فِي كُلِّ بَدْعَةٍ أُحْدِثَهَا الْعَصْرِيُّونَ الْمُتَقَرَّنُونَ فِي الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ كَيْدٌ لِلدِّينِ وَمَحَاوَلَةٌ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لَكِنْ كَيْدُهُمْ فِي فَصْلِهِ عَنِ السِّيَاسَةِ أَهْمَى وَأَشَدَّ مِنْ كُلِّ كَيْدٍ فِي غَيْرِهِ، فَهُوَ ثَوْرَةٌ حُكُومِيَّةٌ عَلَى دِينِ الشَّعْبِ“^{১১}

^৯ শায়েখ রহঃ তাওকাদ শহরের আনাজুলে ১৮৬৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা শায়েখ আহমাদ তাওকাদি রহঃ। এর নিকট লাভ করেন। শায়েখ শৈশবেই কুরআনে কারিম হিফজ করেন। তিনি ১৮৯০ সালে তরুণ সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতেহ জামে মসজিদের খতিব নিযুক্ত হন, অথচ তখন তিনি বিবাহ করেন নি। ১৯৫০ সালে মিসরে স্ট্রীকে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শায়েখ যাহেদ কাউসারি বলেন- তিনি হচ্ছেন মুজাহিদদের চোখের শীতলতা। আরবের প্রসিদ্ধ হানাফি আলিম শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন- তাঁর কিতাব “মাউকিফুল আকল” হচ্ছে যুগের শ্রেষ্ঠ একটি গ্রন্থ। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

^{১০} الشيخ مصطفى صبري و موقفه من الفكر الوافد - صفحة 484 - مؤلف الدكتور مفرح بن سليمان القوسي

^{১১} موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين - جلد 4 - صفحة 281

“বাস্তবতা হল, রাজনীতি থেকে ইসলামকে আলাদা করা মূলত ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বৈ কিছু নয়। যাতে ইসলামকে ধ্বংস করা যায়। বর্তমানে পশ্চিমা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যেক নব্য বিষয়ে দ্বীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে এবং যুদ্ধ করছে। কিন্তু ইসলামকে রাজনীতি থেকে আলাদা করা অন্য সকল চক্রান্তের চেয়ে অধিক মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক। কারণ এটা সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণের ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রোশ।”

বাস্তবতা হল, রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে আলাদা করা দ্বীনের বিরোধিতা বৈ কিছু নয়। যেন দ্বীনকে ধ্বংস করা যায়। বর্তমানে পাশ্চাত্যের অনুসারীরা সকল নব্য কাজে দ্বীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। কিন্তু ইসলামকে রাজনীতি থেকে আলাদা করা অন্য সকল চক্রান্ত থেকে বেশি ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক। কারণ এটা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণের ধর্মের প্রতি আক্রোশ।

পশ্চিমা এ কাজটি যেমনভাবে নিজেদের এজেন্ডা দ্বারা তুরস্কে ঘটিয়েছিল তেমনিভাবে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও নামকা ওয়াস্তে স্বাধীনতার পর স্থানীয় এজেন্ডাদের দ্বারা ঘটিয়েছে এবং তুরস্কে যেভাবে ঘটিয়েছে ঠিক সেভাবেই অন্যান্য জায়গাতেও ঘটিয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু, তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে ধর্মহীনতাকে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করে মুসলমানদের ব্যক্তি-জীবনেও ইসলামের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করেছে। আর অন্যান্য (মুসলিম) রাষ্ট্রে পাশ্চাত্যের কুফুরী সম্প্রদায় এই শেষ ধাপটি বাস্তবায়ন করতে অন্য কোন সুযোগের অপেক্ষায় আছে। বাকী দেশ, রাজনীতি এবং সমাজ থেকে ইসলামকে সমূলে নির্মূল করে সেখানে পশ্চিমাদের দেয়া গণতন্ত্র, পুঁজিবাদী ক্ষমতা, আইন ও প্রথা চালু করে দিয়েছে।

বর্তমানে কুফুরী শক্তির লাগাম আমেরিকা ও ইসরাইলের হাতে। তাদের চিত্র হল, কিছু মুসলিম দেশে নিজেরা আক্রমণ করে মুসলমানদের উপর যুলুম-অত্যাচার অব্যাহত রেখেছে। আর কিছু মুসলিম দেশে নিজেদের অনুগামী ক্ষমতাবাহী ব্যক্তি ও সৈনিকদের দ্বারা ধর্মহীনতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আক্রমণ করেছে। ইসলাম কায়ম ও শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নের শব্দ যারা মুখে উচ্চারণ করে তাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে যে প্রত্যেক মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ হয় সে ব্যাপারে উম্মতের ফকীহগণের কিতাবে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে ফেকাহর যে কোন কিতাব যদি হাতে নিয়ে খুলেন তাহলে দেখতে পাবেন। হিজরী সনের চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন ইমাম আবু বকর জাস্সাস হানাফী রহ. তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ ‘আহকামুল কুরআনে’ লিখেছেন-

وَمَعْلُومٌ فِي اعْتِقَادِ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ إِذَا خَافَ أَهْلُ التَّغْوَرِ مِنَ الْعَدُوِّ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ مَقَاوِمَةٌ لَهُمْ فَخَافُوا عَلَى بِلَادِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَذَرَّارِيَهُمْ أَنَّ الْفَرَضَ عَلَى كَافَّةِ الْأُمَّةِ أَنْ يَنْفِرُوا إِلَيْهِمْ مَنْ يَكْفِي عَادِيَتَهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ. وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْأُمَّةِ-.

“সকল মুসলমানের আকীদায় এ কথা বদ্ধমূল আছে যে, যখন মুসলমান সীমান্ত-অধিবাসীরা শত্রুর পক্ষ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করে এবং তাদের মোকাবেলা করার ক্ষমতাও সেই লোকদের না থাকে, যার ফলে তারা তাদের দেশ, বংশ এবং নিজেদের ব্যাপারে আতঙ্কগ্রস্ত থাকে তাহলে তখন সকল মুসলমানদের উপর সেই

(সীমান্তবর্তী) লোকদের পক্ষে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া ফরয হয়ে যায় - যেন মুসলমানদের উপর থেকে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। আর এ ব্যাপারে উম্মতের কোন ব্যক্তি দ্বি-মত করেনি।”

পাঠকবৃন্দ! কথাগুলোতে একটু চিন্তা করুন, যখন কাফের শত্রুদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা থাকে তখন তার মোকাবেলার জন্য জিহাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের কেউ দ্বি-মত করেনি। কারণ এর দ্বারা এমন আক্রমণকারী শত্রুর মোকাবেলা হবে যার আক্রমণ শুধু মানুষের জানের উপর হয় না বরং ঈমানের উপর হয়। এটা শুধু দেহকে শেকলবন্দী করবে না বরং অন্তরে কাষ্ঠ ঢেলে ইসলামকে শেকলবন্দী করবে। যেখানে ইসলাম শুধু জানের আশঙ্কাকে প্রতিহত করার জন্য জিহাদ ফরয করেছে তাহলে যেখানে দীন শঙ্কায় পরে যায় সেখানে কি কোন সত্যিকার মুসলমান ভিন্ন মত পোষণ করতে পারে!! কখনো না।

পৃথিবীর যে প্রান্তই হোক না কেন, যদি তাতে কোন সময় ইসলাম বিজয়ী ছিল কিন্তু আজ পরাধীন, তাহলে সেখানে আবার ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে জিহাদ করা ফরয।

শায়েখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহ.^{১২} এর সেই কথাগুলো আজও কানে বাজে, তিনি বলেছিলেন :

"هذه قاعدة اتفق عليها جميع الفقهاء والمحدثين والمفسرين والأصوليين، ما رأيت فقيها كتب في الجهاد إلا ونص على هذا النص؛ على أن القتال أو الجهاد يصبح فرض عين على كل مسلم، إذا غزي أي شبر من أراضي المسلمين حتى يطهر هذا الجزء، كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه".

¹² শায়েখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাল্লাহু তা'আলা ১৯৪১ সালে ফিলিস্তিনের জেনিন প্রদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী আসবাহ আল হারতিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া সুনামের সাথেই শেষ করেন। ক্লাসে সবার চেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও তিনি সবচেয়ে বেশী সুদর্শন ও মেধাবী ছিলেন। এরপর তিনি গ্রিকালচার কাদরী কলেজে ভর্তি হন। এবং সেখান থেকেই ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর দক্ষিণ জর্দানের আদ্রির নামক গ্রামে শিকতা পেশায় যোগদান করেন। কিন্তু তার পিপাসার্ত মন তখনো ছিল অস্থির-উতলা। তাই দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে শরিয়াহ বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৬৬ সালে শরিয়াহ (ইসলামী আইন) এর উপর বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি জর্দানে থাকাবস্থায় ইসরাঈলী আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি জিহাদে যোগ দেন। অতঃপর মিসরে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এবার তিনি ইসলামী আইন শাস্ত্রে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করলেন। এবং ১৯৭১ সালে তিনি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাণ্ডিত্যের পুরস্কার লাভ করেন। সে বৎসরই তিনি ইসলামী আইনের বিজ্ঞান ও দর্শন (উসূলুল ফিকহ) এর উপর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে মিশরে অবস্থানকালে শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব (রহ) এর (১৯০৬-১৯৬৬) পরিবারের খোঁজখবর নিতে যান। অতঃপর শায়েখ এক পর্যায়ে আরবে শিক্ষকতা পরিত্যাগ করে জিহাদের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানে হিজরত করেন। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের চেষ্টা ও মুজাহাদার ফলে আফগানিস্তানের বেশ কয়েকটি মুজাহিদ গ্রুপ একত্রিত হয়। তারা একই আমীরের নির্দেশে চলতে লাগল, ফলে শত্রুদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। মুজাহিদরা প্রত্যেক ফ্রন্টে বিজয় ছিনিয়ে আনতে লাগল। এ অবস্থায় শত্রুরা তাকে সহ্য করতে পারল না। তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করল। তাকে হত্যার কৌশল খুঁজতে লাগল। ১৯৮৯ সালের ২৪শে নভেম্বর, শুক্রবার শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম যে পথ দিয়ে জুমআর নামায আদায় করতে যেতেন সে পথে তিনটি বোমা পুঁতে রাখল। রাস্তাটি ছিল সরু। একটির বেশি গাড়ি তা দিয়ে অতিক্রম করতে পারত না। দুপুর ১২.৩০ মিনিটে শাইখের গাড়িটি ঠিক বোমা যেখানে পুঁতে রাখা হয়েছিল সেখানে এসে থামল। সে গাড়িতে ছিলেন শাইখ ও তাঁর দুই ছেলে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ। তার আরেক পুত্র তামীম আদনানী আরেকটি করে পিছনে পিছনে আসছিল। শাইখ গাড়ি থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলেন। আর তখনই বিকট শব্দ করে শত্রুদের পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরিত হল। বিস্ফোরণের ভয়াবহ আওয়াজে কেঁপে উঠল শহর। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই মসজিদ ও আশপাশের মানুষেরা দৌড়ে এল। ইতোমধ্যে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। শায়েখ ও তাঁর সঙ্গে থাকা সন্তানরা শাহাদাত বরণ করেন। ইম্মালিল্লাহি ওয়া ইম্মা ইলাইহি রাজিউন।

“এ মূলনীতির ব্যাপারে সকল ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসূলবীদ ঐকমত্য পোষণ করেছেন, জিহাদ সম্পর্কে লেখেছেন এমন প্রত্যেক ফকীহকে আমি দেখেছি যে তিনি এ বিষয়টি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন যে, যখন কোন মুসলিম ভূখণ্ডের এক বিঘত পরিমাণ জায়গার ওপর কাফেরদের পক্ষ থেকে আক্রমণ করা হয়, তখন প্রত্যেক মুসলমানের ওপর নামায ও রোজার মত যুদ্ধ বা জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়, কাফেরদের থেকে এ ভূখণ্ডটুকুকে পবিত্র করা আগ পর্যন্ত তাদের জন্য তা পরিত্যাগ করার কোন অবকাশ নেই।”

আমেরিকার পক্ষ থেকে ঘোষিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে, এটাই কারণ ছিল যে, যখন আমাদের পাকিস্তানের ওপর ক্ষমতাশীল শাসক ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাগণ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে তখন আমাদের এ প্রিয় অঞ্চলের বুয়ুর্গ আলেমে দ্বীন আমাদের মাথার মুকুট মুফতি নিজামুদ্দীন শামজাই শহীদ রাহ.¹³ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়া প্রদান করেছেন।

আর এ কথাটিই এ যুগের সম্মানিত আলেমে দ্বীন মুফতি আতীকুর রহমান শহীদ রাহ. বর্ণনা করে বলেন :

”اگر بے ایمان صدر بُش صلیبی جنگ کا اعلان کرسکتا ہے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا
اسلامی جہاد کا اعلان کرنے سے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جہاد نہیں کریں
گے، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی اسلام کو سرنگوں کرنے کی کوشش کی جائے
گی، ان شاء اللہ مجاہدین اپنی ہتھیالیوں پر سر رکھ کر اور اپنے کفن سر پر باندھ کر نکل آئیں
گے اور اللہ کی قسم کسی جگہ پر بھی ان شاء اللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔“

¹³ মুফতি নিজামউদ্দিন শামজাই (রঃ) সোয়াতে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর ১৯৬০ সালের দিকে দ্বিনি তালিম হাসিলের জন্য করাচির দারুলু খায়ের মাদ্রাসায় ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি দীর্ঘদিন ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে জামিয়া ফারুকিয়া মাদ্রাসার সাথে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর তিনি জামিয়া ফারুকিয়া মাদ্রাসার ইফতা বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১৯৮৮ সালে মুফতি এবং শিক্ষক হিসেবে তিনি করাচির বিনরি টাউনে জমিয়াতুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসায় যোগ দেন এবং শাহাদাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। মাওলানা হাবিবুল্লাহ মুখতার এর মৃত্যুর পর থেকে তিনি জমিয়াতুল উলুম ইসলামিয়ার ইফতা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৯৯০ সালের শুরুর দিকে, জামশর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইমাম বুখারীর শায়েখদের (শিক্ষকের) উপর পিএইচডি করেন। তারপর থেকে তিনি বিনরি টাউন মাদ্রাসায় বুখারী শরীফেরও দারস দিতেন।

তিনি আরবি, ফারসি, পুশতু ও উর্দু ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। প্রতি জুমুয়াবার উর্দু ‘দৈনিক জং’ পত্রিকায় তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এর আগে তাঁর উস্তাদ মাওলানা মোহাম্মাদ ইউসুফ লুদিয়ানবি (রঃ) করাচিতে শহীদ হবার আগ পর্যন্ত এই প্রশ্ন-উত্তর প্রদান করতেন। মুফতি শামজাই (রঃ) ছিলেন ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান এবং তালিবান মুজাহিদ্দীনদের একজন বড় সমর্থক। আফগানিস্তানের ইসলামিক শাসনামলে তিনি কয়েকবার সেখানে সফর করেন এবং মোল্লা মোহাম্মদ ওমর (রহ.) এর সাথে সাক্ষাত করেন। মোল্লা ওমর (রহ.) তাঁকে অনেক সম্মান করতেন।

মুফতি শামজাই (রঃ) ঐ সকল আলেমদের অন্যতম যারা ১৯৭৯-৮০ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতওয়া প্রদান করেন। ২০০১ সালের শেষের দিকে ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তানে ক্রুসেডার আমেরিকার হামলার পরও তিনি মুজাহিদ্দীনদেরকে ক্রমাগতভাবে সমর্থন দিয়ে যান।

২০০৪ সালের মে মাসে ইসলামের শত্রুরা আততায়ী প্রেরণ করে তাঁকে শহীদ করে দেয়। তাঁর শাহাদাত লাভের পর করাচিতে শেরশাহ এলাকার জামিয়া উসমানিয়ার প্রধান ক্বারী মোহাম্মদ উসমান তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেনঃ

“তিনি ছিলেন পাকিস্তানে ইসলামের সর্বোচ্চ আলেম। যদিও পাকিস্তানের মুফতি-এ-আম হচ্ছেন মুফতি রাফিউদ্দিন উসমানী কিন্তু আমরা সহজেই মুফতি নিজামউদ্দিন শামজাইকে সমান মাপের বলতে পারি।”

”اللہ کا فیصلہ ہے اب اللہ کا نور پیچھے نہیں ہٹے گا اور کامل واکمل ہو کر رہے گا۔ اور ان شاء اللہ انہی مدارس سے تحریک اٹھے گی اور پاکستان کے لیے ہمارے لاکھوں مسلمانوں نے جانیں دیں اور خون کے دریا عبور کر کے پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، آج تک ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ جس طریقے پر افغانستان میں اسلامی نظام نافذ ہو چکا ہے، ان شاء اللہ پاکستان میں بھی اسلامی نظام نافذ کر کے دم لیں گے۔“

“যদি বেঙ্গলমানদের প্রেসিডেন্ট ‘বুশ’ ক্রুসেড যুদ্ধের কথা ঘোষণা করতে পারে তবে ইসলামী যুদ্ধের কথা ঘোষণা করতে আমাদেরও কেউ বাধা দিতে পারবে না। আজ যে সব লোকেরা এ কথা বলে যে, আমরা পাকিস্তানে যুদ্ধ করব না, আমি তাদেরকে বলতে চাই যে, যেখানেই ইসলামকে অবনত মস্তক করার ইচ্ছা করা হবে আল্লাহ চাহেন তো সেখানেই মুজাহিদগণ নিজেদের হাতের তালুতে মাথা রেখে এবং নিজের কাফন মাথায় বেঁধে বের হয়ে পড়বে, আল্লাহর শপথ! ইনশাআল্লাহ! কোথাও তারা পিছু হটবে না।”

“আল্লাহর ফায়সালা, এখন আল্লাহর ‘নূর’ পিছু হটবে না, বরং তা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গই হয়ে থাকবে, ইনশাআল্লাহ! এই মাদ্রাসাগুলো হতে আন্দোলন শুরু হবে, আর পাকিস্তানের জন্য আমাদের লাখ লাখ মুসলমান প্রাণ দিয়েছিলেন, এবং রক্তের সাগর পাড়ি দিয়ে পাকিস্তানে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এসেছিলেন, আজ পর্যন্ত আমাদেরকে শুধু খোঁকা দেওয়া হয়েছে। আমাদের ফায়সালা হল, যেভাবে আফগানিস্তানে ইসলামী নেয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইনশাআল্লাহ! পাকিস্তানেও ইসলামী নেয়াম প্রতিষ্ঠিত করেই তবে দম নিব।”

হে পাকিস্তানের সম্মানিত মুসলমান ও দ্বীনী আত্মমর্যাদার ধারক, ইসলামের নওজোয়ানেরা! আজ আমাদের জিম্মাদারী হল, জমীনে বিশেষকরে পাকিস্তান সহ পুরো উপমহাদেশে ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদের পতাকা উঁচু করা। আমাদের বড়রা অনেক ত্যাগ স্বীকার করে এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে উলামা ও বুযুর্গদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যেন এই ইসলামের কালিমা উঁচু হয় এবং মুসলমানগণ ইসলামের ছায়াতলে জীবন যাপন করতে পারেন। কিন্তু এ অঞ্চলের ক্ষমতাসীন ও এখানকার বিশ্বাসঘাতক সেনাবাহিনী অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকবর্গ ও সৈন্যদের মত আমেরিকা ও পাশ্চাত্য কুফরী সম্প্রদায়ের কাতারে शामिल হওয়া এবং তাদের নেতৃত্বে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও শরীয়তের বিধান প্রয়োগকে রোধ করার পথ নির্বাচন করে নিয়েছে, পার্লামেন্টের মাধ্যম কালিমা লিখে দেওয়া এবং আইনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ধারা অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া তো ঠিক ঐরূপ যেমনটা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই করে ছিল এবং যেমনটা পুরো ইসলামী ইতিহাসে বেদ্বীন ও যিন্দিকরা করে এসেছে, তাদের থেকে কোন কল্যাণের আশা করা অনর্থক, কেননা স্বয়ং এরাই দ্বীনের দুষমন, এই বাস্তবতা আজ প্রত্যেক পাকিস্তানীর সামনে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া আবশ্যিক, তাদের ইতিহাস, তাদের কথাবার্তা ও তাদের কর্ম সবই এ কথার ইঙ্গিতবহন করে, এ ধরনের লোকদের না ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক আছে, না উপমহাদেশের মুসলমানদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক আছে, না পাকিস্তান গঠনের ত্যাগের সাথে তাদের কোন গরজ ছিল,

বরং তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাদের পশ্চিমা মনিবদের ন্যায় ইসলামের বিধানবলী প্রয়োগের রাস্তা রোধ করে নিজেদের দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাসিল করা।

সুতরাং আমাদের উপর জরুরী হল, আমাদের এ ভূমিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ঘর থেকে বের হওয়া, এ পথের প্রতিবন্ধকগুলোর মোকাবেলা করা এবং এ ভূমিতে আরোপিত পশ্চিমা রাজনৈতিক ব্যবস্থা খতম করা। আর এ প্রথার (গণতন্ত্রের) পরিচালক ও সংরক্ষকদের থেকে (দেশ ও জাতীকে) মুক্ত করা এবং এদের স্থলে নেককার, মুখলেস ও মুসলমান নেতৃত্বে নিয়ে আসা। যিনি এখানে গণতন্ত্র ধ্বংস করে শরীয়ত মোতাবেক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন। যেখানে ন্যায়-ইনসাফের আলোচনা হবে। শরীয়তের হকসমূহ বিজয়ী হবে। আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতাকে প্রতিহত করা হবে। মজলুমদের ন্যায় বিচারে স্থান হবে এবং দুনিয়ার সকল মুসলমানদের জন্য আশ্রয়স্থল হবে।

এমনকি তের শতাব্দী যাবত দ্বীপ্তিময় যে ইসলাম এখানে মস্তকাবনত হয়ে আছে তা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং ইসলামাবাদ থেকে শুরু করে দিল্লি, ঢাকা ও রেঙ্গুন (ইয়াঙ্গুন) পর্যন্ত তা ছড়িয়ে যাবে।

এখানে আমি আমাদের সম্মানিত উলামায়ে কেরামদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ আল্লাহ তায়ালা নেক কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব উলামায় কেরামদের দিয়েছেন। আমাদের এ ফরয বিধানের কাম্য হল, সাধ্যানুযায়ী আমাদের প্রিয় জন্মভূমি পাকিস্তান (এবং বাংলাদেশ) এর উপর জোরপূর্বক আরোপিত আমেরিকান (এবং ভারতের) চাটুকার সরকার এবং সেনাপ্রধানদের অনিষ্টতাকে হাত দ্বারা প্রতিহত করা। যেখানে মুখ দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে বলার সাধ্য থাকবে সেখানে মুখ দ্বারা তাদের বিরোধিতা করা। আর যেখানে এ দুটো সম্ভব নয় সেখানে অন্তর দ্বারা এদেরকে খারাপ ধারণা করতে হবে। তবে আমাদের কোন কথা বা কাজ তাদের পক্ষে যেন শক্তি না যোগায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা - আল্লাহ না করেন- তাদের পক্ষে শক্তি যোগানো দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে ধ্বংস করার নামান্তর।

ইমাম আবুল মানসূর মাতুরিদী রহ. এর বক্তব্য -আশা করি সবারই জানা আছে- তা হল, "من قال لسلطان" ۲৪
"زماننا عادل فقد كفر" - কারণ এর দ্বারা যুলুমকে ইনসাফ বলা হয়।

ইমাম আবু মানসূর মাতুরিদী রহ. এর সময়ের বাদশাহদের ব্যাপারে এ কথা বলেছেন, তাহলে আজ-কালের সরকার প্রধানদের বিষয় কী হবে!!

এ জন্য উলামায়ে কেরামদের নিকট আরয, তাঁরা যেন এ দেশে আরোপিত যালেম সরকার এবং সেনা-অফিসারদের থেকে নিজেদের দূরে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে দ্বীনদার-মুজাহিদদের সহযোগিতা করে।

সর্বশেষ কথা হল, আজ জিহাদ আমেরিকা, ইসরাইল, হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আমেরিকান গোলাম সরকার ও জেনারেলদের বিরুদ্ধে দাড়া করানো হয়েছে। সুতরাং এ উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে সমাজে কোন অস্বাভাবিক কার্য পরিচালনা করা- যার দ্বারা সাধারণ মুসলমানের ক্ষতি হয় এবং যাতে শরীয়তের প্রতি

কোন ঝগ্গেপ করা হয় না, এমন কোন কাজ জিহাদ হওয়ার যোগ্য নয়, বরং এগুলো বিশৃঙ্খলা। এজন্য জিহাদ এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে পার্থক্যটা প্রত্যেক মুসলমানের নিকট স্পষ্ট থাকা জরুরী। যেন তিনি (মুসলমান) ইসলাম ও শরীয়ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে জিহাদ করে এবং বিশৃঙ্খলার পথ রোধ করে। বিশৃঙ্খলার কারণে যেন পরিণত না হয়।

আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে ইসলামের বিজয়ের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করার তাওফিক দান করেন এবং আমাদেরকে এই উপমহাদেশে ইসলামের বিজয় দেখান। আমীন।